



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 613 - 619

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বনলতা সেন : প্রচ্ছদের নানা প্রকরণ

সম্বিত বসু

গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

Email ID: sambitmore@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Jibanananda Das,
Banalata sen,
Kobita/ poetry
Journal
magazine,
Buddhadeb Basu,
Book Cover,
Satyajit Ray.

Abstract

In the history of Bengali poetry, 'Banalata Sen' has earned the status of an eternal poem. Published in 1935 in 'Kobita' magazine, edited by Buddhadeb Basu, this poem continues to be read and discussed even after 90 years. Scholars, teachers, and thinkers are engaged in unraveling its meaning. However, beyond this conventional approach, 'Banalata Sen' remains a source of wonder and enchantment for non-academic poetry enthusiasts as well. Perhaps, this is why the poem will continue to endure in the galaxy of Bengali language. For the present writer, 'Banalata Sen' is as enigmatic as its cover design and the language it embodies. The artistic expression of Banalata Sen on the cover flows parallel to the poem. Yet, there is a lack of detailed discussion on the cover, which is unusual. If the cover is treated as a 'text' to read and understand the poem, it offers an alternative interpretation. The cover artist's 'reading' is embedded in it. Shambhu Saha, apart from Satyajit Ray's cover, many artists have illustrated Banalata Sen, though not as a cover art. These illustrations also reflect the artist's unique observation blended with Jibanananda's experience. The present researcher aims to explore the enigmatic hints in the cover design in this article.

Discussion

বাংলা কাব্যগ্রন্থের ইতিহাসে, চিরস্থায়ী কবিতা বইয়ের মর্যাদা পেয়েছে 'বনলতা সেন'। ১৯৩৫ সালে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর, এই ৯০ বছর পার করেও সম্ভবত একইভাবে পঠিত, আলোচিত। তার মর্মার্থ উদ্ধারে ব্রতী গবেষক, শিক্ষক, চিন্তকরা। কিন্তু কবিতা পাঠের এই গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরেও একজন অ-বিদ্যায়তনিক কবিতাচর্চাকারীর কাছেও বনলতা সেন একই রকম বিস্ময়কর, মনোমুগ্ধকারী রহস্যময়তা নিয়ে হাজির হয়। সম্ভবত, সে কারণেই এই কবিতা আরও বহুকাল টিকে থাকবে বাংলাভাষার গ্রহতারকায়। বর্তমান প্রাবন্ধিকের কাছে 'বনলতা সেন' কবিতাটি যতটা রহস্যময়, তার প্রচ্ছদ নির্মাণ ও প্রচ্ছদ ভাষ্যও কম রহস্যময় বলে মনে হয় না। প্রচ্ছদের বনলতা সেন-এর শৈল্পিক ব্যঞ্জনা কবিতার সমান্তরালে বহমান। অথচ সেভাবে এই বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা তুলনায় অমিল। প্রচ্ছদকে কবিতা পড়ার-বোঝার 'টেক্সট' বা 'পাঠ্য' করে তুললে, কবিতার আরেকরকম পাঠোদ্ধার করা সম্ভব। যেহেতু প্রচ্ছদশিল্পীর 'রিডিং' রয়েছে সেই প্রচ্ছদে। শম্ভু সাহা, সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ

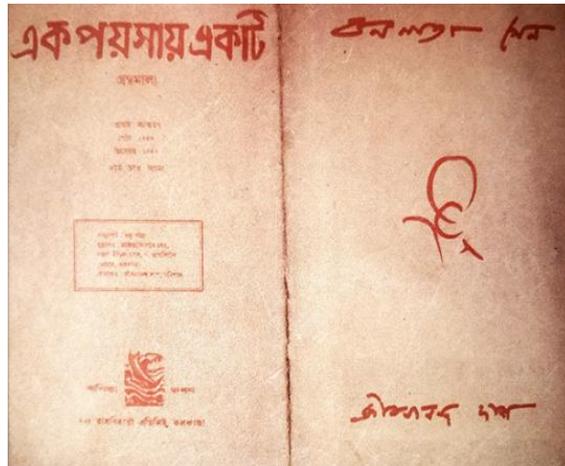
ছাড়াও বনলতা সেনের ছবি এঁকেছেন বহু শিল্পীই। যদিও সেগুলি প্রচ্ছদ নয়, কিন্তু তাতেও মিশে রয়েছে জীবনানন্দীয় অভিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পীর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ। বর্তমান গবেষক যদিও শুধুমাত্র প্রচ্ছদের রহস্যময়তার ইঙ্গিতগুলিই এই প্রবন্ধে আকার দিতে চাইছে।

ডিসেম্বর, ১৯৩৫। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি প্রথমবারের মতো প্রকাশ পাচ্ছে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকায়। বাংলা হিসেবে পৌষ, ১৩৪২। ৭ বছর পর, ১৯৪২ (পৌষ, ১৩৪৯) সালে জীবনানন্দ দাশ তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করছেন এই কবিতাকে। তা ছিল বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা-ভবন’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘এক পয়সার একটি’ সিরিজের অন্তর্গত। প্রকাশক: স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ! ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ রয়েছে বরিশালের কথাও। ১৬ পাতার এই বইয়ে কবিতা সংখ্যা ১২টি। প্রচ্ছদ করেছেন শম্ভু সাহা। বাংলা ভাষার ‘কিংবদন্তি’ এই কবিতা বইয়ের প্রথম প্রচ্ছদ শম্ভু সাহারই। খুব বেশি প্রচ্ছদ করেননি তিনি। তিনি পেশায় ছিলেন ফোটাগ্রাফার। থাকতেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, বুদ্ধদেব বসুর বাড়ির কাছেই। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি তোলার জন্যই। তাঁর করা ‘বনলতা সেন’-এর প্রচ্ছদ, আজকের ভাষায় যাকে বলে ‘মিনিমালিস্টিক’- স্বল্পরেখার নির্মাণ। প্রচ্ছদে পিছমোড়া করে এক নারীর ছবি। যার খোঁপাটি স্পষ্ট। অল্প লালচে আভাময় সেই প্রচ্ছদের উপরে লেখা ‘বনলতা সেন’, নীচে ‘জীবনানন্দ দাশ’ – কবির নাম। দুটোই সম্ভবত কবির হস্তাক্ষরে।

এখানে কবির হস্তাক্ষরই ব্যবহার করা হয়েছিল, নাকি শম্ভু সাহা জীবনানন্দ দাশের হস্তাক্ষরের অনুরূপ ছাঁদ প্রচ্ছদে হাজির করেছিলেন, তার কোনও নথি বা তথ্য বর্তমানের গবেষকের কাছে নেই। তবে জীবনানন্দ দাশের স্বাক্ষরের সঙ্গে এই বইয়ের প্রচ্ছদে লেখা ‘জীবনানন্দ দাশ’ ছব্ব মিলে যায়। এই ধরনটি অবশ্য পরবর্তীকালেও জীবনানন্দ দাশের আরেকটি বইয়ের প্রচ্ছদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছিল। তা ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’। ১৯৫৬ সালে ‘সিগনেট প্রকাশন’ থেকে যখন এই কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ডিএম লাইব্রেরি, ১৯৩৬ সাল) প্রকাশিত হয়, তখন এই জীবনানন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরের এই সাদৃশ্য ফিরিয়ে এনেছিলেন সত্যজিৎ রায়। বর্তমান প্রাবন্ধিক মনে করে, জীবনানন্দর স্বাক্ষরের ব্যবহার শম্ভু সাহার করা ‘বনলতা সেন’-এর প্রচ্ছদের তুলনায় ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় সংস্করণের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে অধিকতর অর্থবহ। কারণ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে হস্তাক্ষরের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই সেই হস্তাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন। স্মরণীয় এই যে, বইটির প্রচ্ছদের নেপথ্য রংও সাদা – পাঠক তা পাণ্ডুলিপির কাগজ হিসেবে ভেবে নিতেই পারেন। যদিও আজকের কোনও তরুণ কবির ‘পাণ্ডুলিপি’র সঙ্গে হস্তাক্ষর ব্যাপারটি অঙ্গঙ্গী জড়িয়ে থাকবে, তার কোনও অর্থ নেই। বরং অধিকাংশ প্রকাশন সংস্থা পাণ্ডুলিপি আহ্বানের সময় কবিদের কাছে ‘ওয়ার্ড ফাইল’, ‘পিডিএফ’ ইত্যাদি যন্ত্রনির্মিত পাণ্ডুলিপির আকাঙ্ক্ষা করেন। ফলে এই যন্ত্রযুগে ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ করলে হয়তো সত্যজিৎ রায় অন্য কোনও পস্থা অবলম্বন করতেন।

জীবনানন্দ দাশ যেহেতু এই বইয়ের প্রকাশক, তাই নামলিপি ও প্রচ্ছদে তাঁর হাতের লেখার ব্যবহারকে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছদশিল্পীর অভিরুচি বলেও স্বীকার করতে ইতস্তত বোধ হয়। বলা বাহুল্য, ‘কবিতা’ পত্রিকায় এই কবিতা প্রকাশের পর জীবনানন্দ নিয়ে বাংলা কাব্যের পরিসরে আলোচনার গতিও তরাশ্বিত হয়েছিল।

চিত্র : ১



জীবনানন্দ দাশের এই কবিতা ছাড়াও আরও নানা লেখায় ‘বনলতা সেন’-এর উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে বনলতা সেনের উল্লেখ ‘বনলতা সেন’ কবিতা ও প্রচ্ছদপাঠের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

‘চারিদিকে তাকিয়ে দেখিল শুধু মৌসুমীর কাজলঢালা ছায়া। কিশোরবেলায় যে কাল মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে সে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি- আজ, সে-ই যেন, পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশের দিগঙ্গনা সেজে এসেছে। দক্ষিণ আকাশের সে-ই যেন দিগবালিকা, পশ্চিম আকাশেও সে-ই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মণি, পূব আকাশে আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কাল মুখ। নক্ষত্রমাখা রাত্রির কাল দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মত রূপ তার- প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী চমরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিবারণ দু’খানা হাত, স্নান ঠোঁট, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নবলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলি সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা।

“সেই বনলতা- আমার পাশের বাড়িতে থাকত সে।” (পৃষ্ঠা - ৩৯, কারুবাসনা, জীবনানন্দ সমগ্র, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১৩, ১৯৮৬)

জীবনানন্দের এই উপন্যাস আত্মজৈবনিক। উল্লেখ্য ওই দূরগামী ইঙ্গিতময় বাক্যটি: ‘কিশোরবেলায় যে কাল মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে সে আমাদেরই আঙিনার নিকটবর্তী ছিল, বহু দিন যাকে হারিয়েছি’। এর সঙ্গে বোধহয় মিলে যায় ‘বনলতা সেন’ কবিতার ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’-এর জিজ্ঞাসাকাতর সংলাপ। পুনরায় সেই বনলতা সেনের সঙ্গে যে উপন্যাসেও দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ, লিখছেন, -

“অনেক দিন পরে আজ আবার সে এল, মনপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু’খানা হাত, স্নান ঠোঁট, শাড়ির স্নানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হয় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা।” (পৃষ্ঠা - ৪০, কারুবাসনা, জীবনানন্দ সমগ্র, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০১৩, ১৯৮৬)

উল্লেখ্য, ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থে জীবনানন্দ ‘নগ্ন নির্জন হাত’ নামের একটি কবিতাও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তা যে বনলতা সেনের কাব্যআকৃতি থেকে বহির্ভূত এক কাব্যপ্রয়াস নয়, তার প্রমাণ ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসের এই বাক্যগুলি। জীবনানন্দ এই উপন্যাসেও বারবার বনলতা সেনের অবয়বের নানা বর্ণনা দিয়েছেন, যা বনলতা সেন কাব্যপাঠেরও একটি যাত্রাপথ।

‘বনলতা সেন’-এর প্রথম প্রচ্ছদে শম্ভু সাহার কাজ, সুদূরপ্রসারী চুলকে খোপার ঢং-এর রূপকে, রহস্য আরও অন্তরালে নিয়ে যাওয়ার একরকম প্রচেষ্টা। সে বনলতার মুখ দেখা যায় না। কেবল আন্দাজ করা চলে। সামান্য এক-আধটা টানে, নিরিবিলি ভঙ্গিমায়, কেবল নজর টানে একটি বিবাদী খোঁপা। সেখানে যেমন বাঙালিনীর রূপকল্পটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে, মুখ যেহেতু দেখা যায় না, তাই তীব্র হয়ে ওঠে তার রহস্য। প্রচ্ছদ আসলে সম্ভাবনার কথাই বলে। তা সবসময় ধরিয়ে দেবে না কাব্যগ্রন্থের খুঁটিনাটি। আর ধরিয়ে দিলে, তা নিশ্চিতভাবেই সব ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না দড় মাপের উদার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ যত সূক্ষ্ম হবে, তার পরিণতি ও বিস্তার ততই কার্যকর হবে বলে বর্তমান গবেষকের ধারণা। কিন্তু তুলনায় বেশি লাইনে সত্যজিৎ রায় যে রূপ দেখালেন বনলতা সেনের, সেটিও কম কিছু নয়।

কিন্তু এই কবিতা পড়ে সজনীকান্ত দাসের ‘শনিবারের চিঠি’তে কী রাগ ঝলকে পড়েছিল, জানা জরুরি।

“এই প্রতিভাবান কবিদের আর একটি কৌশল কবিতা লিখিতে লিখিতে অকস্মাৎ অকারণ এক একজন ভদ্রলোকের মেয়ের নাম করিয়া আমাদের উৎসুক ও উৎসাহিত করে তোলা। ‘ইকনমিক্স’ লিখিতে লিখিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অকারণে ‘রাণী’কে টানিয়া আনিয়াছেন। ‘জাতক’-এ শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ‘সুরমা’ নামীয়া কে ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত লজ্জা দিয়াছেন এবং ‘বসন্তের গান’-এ শ্রী সমর সেন ‘মালতী

রায়' নামক কোন কামিনীর 'নরম শরীর' লইয়া যাহা করিবার নয় তাহাই করিয়াছেন। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে 'বনলতা সেন'কে লইয়া।"^{১০} (সজনীকান্ত দাস, শনিবারের চিঠি, সংখ্যা ১৭, বর্ষ ১৩৫৯)

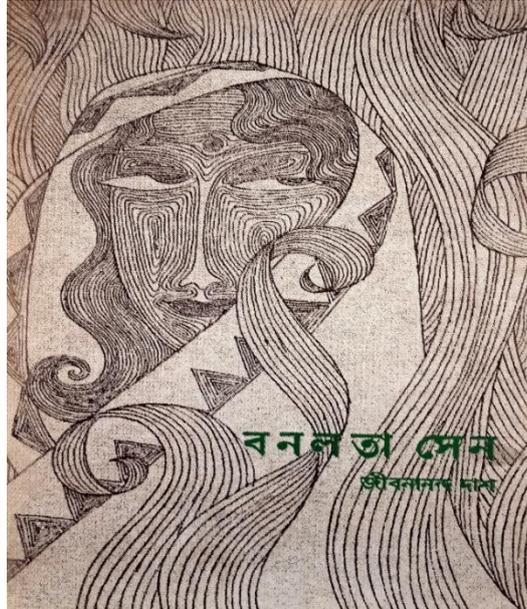
এইখানে সজনীকান্ত দাস জরুরি হয়ে পড়ছেন, কারণ তিনি কবিতার মধ্যে ব্যবহৃত হওয়া নামকে বাস্তবে টেনে আনার তীব্র চেষ্টাচরিত্র করেছেন। অর্থাৎ, কবিতার যে রূপ তার অন্তরে বিকশিত করার চেয়ে বহিরঙ্গে মজে থেকেছেন। পরবর্তীকালে বহু সময়ই দেখা যাবে, বনলতা সেন আসলে কে, সে নিয়ে তৎপর হয়ে পড়েছেন নানা গোত্রের পাঠক। বাংলা কবিতায় এরপর বিভিন্ন সময়ে কাব্যনামে আসা নারীদের বাস্তবে খুঁজে বের করার গোয়েন্দাপ্রবণতাও তৈরি হবে। যা আদর্শে কাব্যপাঠের অন্তরায় বলেই বর্তমান প্রাবন্ধিকের মত। তাছাড়া, জীবনানন্দ ডায়েরিতে লিখছেন- 'Frustration in literature, Love, Herodias Daughters, বনলতা সেন, Imaginary Women, Bus Women and Life'.

বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় - 'সাহিত্যের নৈরাশ্য, ভালবাসা, হেরোদিয়াসের মেয়েরা, বনলতা সেন, কাল্পনিক নারী, বাসের মেয়েটি এবং জীবন।' 'বনলতা সেন'-এর পরই কাল্পনিক নারীর প্রসঙ্গউত্থাপন এখানে বনলতা সেন প্রতিমাটি 'কাল্পনিক' রূপেই পরিচয় দিতে চাইছে হয়তো-বা।

সত্যজিৎ রায় যখন এই 'বনলতা সেন'-এর প্রচ্ছদ করছেন, তিনি খেয়াল রাখছেন বইটির শৈল্পিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক দিকটিও। কলাবিভাগের ভাষায় যাকে বলা হয়: 'কমার্শিয়াল আর্ট'। ১০ বছর পর এই বনলতা সেনের এই দ্বিতীয় সংস্করণ, সিগনেট প্রেস। ১৯৫২। নবরূপে, নতুন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রচ্ছদ করছেন সত্যজিৎ রায়। তখনও প্রবাদপ্রতিমে পরিণত হননি। বাংলা প্রচ্ছদের যে পরিণত রূপবদল তিনি করবেন, তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল। তিনি শম্ভু সাহার মতো আড়ালে রাখলেন না বনলতা সেনের মুখ। আনলেন প্রকাশ্যে। দেখা গেল চোখ, মুখের ভাঁজ, কপাল, চুল। ফয়সাল শাহরিয়ার 'বনলতা সেন' নিয়ে লিখেছিলেন, -

“ 'বনলতা সেন'-এ নারী বিষয়ক কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে; তা হয়তো অস্বাভাবিকও নয়। তবে যথার্থ মনোনিবেশে বোঝা যায় এরা ঠিক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অশরীরী নারী নয়।"^{১১} (পৃষ্ঠা - ১৬৮, বনলতা সেন : ষাট বছরের পাঠ, সম্পাদনা : সৈকত হাবিব, কথাপ্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৯)

চিত্র - ২



সত্যজিৎ রায় 'বনলতা সেন'কে শম্ভু সাহার থেকে বহুলাংশে আলাদা করেই দেখেছেন। সত্যজিৎের সরাসরি পাঠকের সঙ্গে প্রায় দ্বিরালাপ ঘটিয়ে ফেলা বনলতা সেনের মুখাবয়বের একটা উত্তরাধিকার রয়েছে বলেই মনে হয়। যে দু'জন শিল্পীর ছবি বনলতা সেনের পূর্বসূরি, তাঁরা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যামিনী রায়। জীবনের উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথকে স্থির

হতে দিচ্ছে না তাঁর ছবির মন। নিসর্গচিত্র, বিমূর্ত জ্যামিতিক ছবির পাশাপাশি তিনি এঁকে চলেছিলেন একের পর রহস্যময় নারী মুখাবয়বও। রানী চন্দকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চোখ আঁকতে গেলে তাঁর মনে পড়ে কাদস্বরী দেবীর কথা। কিন্তু যামিনী রায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে মতামত এক্ষেত্রে উল্লেখ জরুরি। ২৫ মে, ১৯৪১, যামিনী রায়কে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন -

“গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হ’য়ে উঠতে লাগলো। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগলো যা প্রকাশ হ’য়ে উঠছে। এছাড়া অন্য কোনোও ব্যাখার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করলো। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ-এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি- যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।”^৫ (পৃষ্ঠা - ৮৪, যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক। বিষুঃ দে, আশা প্রকাশনী, মহালয়া ১৩৮৪)

ফলে রবীন্দ্রনাথ যে নারীর মুখ আঁকছেন, তিনি বাস্তবে কে, এই প্রশ্ন করা বৃথা। যেমন বৃথা জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’ আসলে তাঁর বাস্তবের রক্তমাংসের প্রেয়সী কি না, কিংবা আরও পরে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরা কে- এই জাতীয় বাংলা কাব্যবিশারদদের গোয়েন্দাপ্রবণতা বাদ দিয়ে, আসল কবিতারহস্যকে স্পর্শ করাই সম্ভবত সাহিত্যপাঠের জরুরিতম কাজ। রবীন্দ্রনাথের এই নারী মুখাবয়ব আঁকা তিনের দশকের মাঝামাঝি এসে আরও জটিল রহস্যময় হয়ে উঠছে। নেপথ্যে ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ইন্দোনেশিয়া যাত্রা। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বহু রকমের ‘মাস্ক’ বা ‘মুখোশ’ দেখেন। তাঁর এই মুখ ও মুখোশের মুখরতা বিস্ময়ের কথা, কিংবা মহাজাগতিক এক কাকতালে এই তিনের দশকের মাঝামাঝিই তো ‘বনলতা সেন’ প্রকাশিত হচ্ছে ‘কবিতা’ পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের সেই কুহকী নারীমুখগুলিকে পাশে রেখেও ‘বনলতা সেন’-এর পাঠ সম্ভব বলে বিশ্বাস বর্তমান প্রাবন্ধিকের।

‘বনলতা সেন’-এর যখন প্রচ্ছদ আঁকছেন সত্যজিৎ রায়, তখন কি তাঁর একবারের জন্যও মনে পড়েনি রবীন্দ্রনাথের এই রহস্যময় নারীমুখের ইতিহাস? রবীন্দ্রপ্রয়াণের তখন সদ্য ১১ বছর পেরিয়েছে। আরও বছর ১০ পরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই একটি তথ্যচিত্র পড়ে তুলবেন সত্যজিৎ রায়, যে তথ্যচিত্রে সযত্নে ও স্বাভাবিকভাবেই ছবির রবীন্দ্রনাথের কথা রয়েছে। রয়েছে কবিকৃত রহস্যময় নারীমুখগুলিও। এই নারীমুখগুলির পাশাপাশি সত্যজিৎ রায় কতক অঙ্কিত বনলতা সেনকে রাখলে তাদের সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

সত্যজিৎ-কৃত এই প্রচ্ছদ দেখলে মনে পড়ে যায়, ‘কারুবাসনা’ উপন্যাসে জীবনানন্দের বনলতা সেনের বিশদ বর্ণনা। শাড়ি পরা এক নারীর রূপ- ‘অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা নির্জন দু’খানা হাত, স্নান ঠোঁট, শাড়ির স্নানিমা।’ রবীন্দ্রনাথের লম্বাটে মুখাকৃতি সম্ভবত গ্রহণ করলেন সত্যজিৎ রায়, তাঁর নিজস্ব বনলতা সেনকে আঁকতে। ‘হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি আমি পৃথিবীর পথে’- বয়সের, সময়ের এই দীর্ঘতাও রয়েছে বনলতা সেনের মুখে। তার মুখে অজস্র বলিরেখা। যদিও তা মানুষী বলিরেখার মতো সহজ নয়, জটিল। সেই জটিল রেখা আমরা দেখতে পাই গাছের শরীরে। গাছদের বয়স মাপা হয় সেভাবেই। গাছের শরীরের ভঙ্গিমা সত্যজিৎ রায় নিয়ে এসেছেন বনলতা সেনের মুখে।

বর্তমান প্রাবন্ধিক আগেই উল্লেখ করেছে, শুধুই রবীন্দ্রনাথ নয়, বনলতা সেন আঁকার নেপথ্য পূর্ব্ধ্বণ রয়েছে যামিনী রায়ের কাছেও। বনলতা সেনের মুখের আদল রবীন্দ্রনাথের নারী মুখাবয়বের সঙ্গে সাজস্বপূর্ণ হলেও, বনলতা সেনের দৃষ্টি রবীন্দ্র অঙ্কিত নারীদের সঙ্গে মেলে না। তা মেলে, বাংলার পটের সঙ্গে, যামিনী রায়ের পটচিত্রকে আঙ্গিক করে আঁকা বহু ছবির সঙ্গে। যেখানে নারীদের চোখ এমন দীঘল, ভ্রুপল্লব অর্ধনমিত।

ইতিহাস সাক্ষ্য, বই প্রকাশের আগে খানিক উত্তেজিত ছিলেন জীবনানন্দ। তা খানিক স্বভাববিরুদ্ধও বটে। দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেসের কর্ণধারকে চিঠি লিখছেন, জানাচ্ছেন বইতে প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা পেলে সঙ্গে জুড়ে দেবেন এই সংকলনে। বই যখন প্রকাশিত হল, চিঠিতে লিখছেন, -

“বনলতা সেন’ বইটি পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। খুবই চমৎকার বই হয়েছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।”^৬ (পৃষ্ঠা-১৫০, জীবনানন্দ পত্রাবলি, পাঠক সমাবেশ, ১৯২২, সম্পাদক: ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)

১৯৫২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ‘সিগনেট প্রেস’-এর কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তকে এ চিঠি লিখছেন জীবনানন্দ। তিনি কোথাও উল্লেখ করছেন না প্রচ্ছদের কথা। বরং বইয়ের ব্যাপারে এই চিঠিতে তিনি আরও লিখছেন, -

“বাংলা সাহিত্য- বিশেষ ক’রে কাব্যসাহিত্যের জন্যে সিগনেট প্রেস শ্রেষ্ঠ অগ্রণীর কাজ করেছে। এ কাজ নিখুঁত, আন্তরিক; সাহিত্যকে নতুন গৌরব ও চরিতার্থতা এনে দিল। সিগনেট প্রেস সিদ্ধির পথে চলেছে; দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস যে নতুন যুগে এনে দাঁড় করিয়েছে আমাদের তার আগাগোড়া সিগনেটের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।”^৭ (পৃষ্ঠা - ১৫০, জীবনানন্দ পত্রাবলি, পাঠক সমাবেশ, ১৯২২, সম্পাদক: ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)

এই চিঠিতে কোথাও উল্লেখ নেই প্রচ্ছদ নিয়ে একটি কথাও। কিন্তু সুরজিৎ সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ লিখছেন,-

“সুরজিৎ,
তোমার সব চিঠিই পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। আমি নানা ব্যাপারে বড় বিব্রত আছি; উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল; কিছু মনে করো না। তুমি কি অমলেন্দুবাবুকে ‘সাতটি তারার তিমির’ ও ‘বনলতা সেন’ পাঠিয়েছিলে? আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে তুমি পাঠাবে।
তুমি আমার একটি চিঠি কবিতার বই ছাপতে চাচ্ছ; কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এখন ও-ধরনের বই ছাপিয়ে কোনো লাভ নেই। ওকাজে তুমি এখন আর হাত দিও না। আমার ‘বনলতা সেন’ দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এমন খারাপ প্রচ্ছদপট আমি আমার জীবনেও দেখি নি। Signet Pressএর হাতেও বইয়ের এই দশা। এরপর কবিতার বই বার করলে আমি নিজে আগাগোড়া সব দেখে শুনে ঠিক করব।”^৮ (পৃষ্ঠা - ১৭৪, জীবনানন্দ পত্রাবলি, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০২২, সম্পাদনা ও ভূমিকা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)

১৯৫২ সালের ১০ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশের এই চিঠি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, প্রচ্ছদ নিয়ে কবির ‘সেনসিটিভিটি’। কেবলমাত্র কাব্যচর্চা করেই তিনি ক্ষান্ত, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং কবি হিসেবে তিনি প্রচ্ছদ নিয়ে ভাবছেন। হয়তো তাঁর মতের সঙ্গে মিল হচ্ছে না প্রচ্ছদশিল্পীর। জীবনানন্দ যে পথে বনলতা সেনকে ভেবেছেন, সেই পথ ধরে হাঁটেনি সত্যজিৎ রায়। হাঁটেনি বলেই তো আরেকরকম বনলতা সেনের পাঠ তৈরি হয়েছে উত্তরকালে।

বোন সুচরিতা দাশকে যে-কথাটি বলেছিলেন, তাতে বোধহয় আমবাঙালির এই প্রচ্ছদ নিয়ে যে গতানুগতিক রোমান্টিকতা, তা ভেঙে যাবে। জীবনানন্দ লিখছেন -

“এই বইয়ের প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বল তো? আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগে নি। আমি কি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে এই সব কবিতা লিখেছিলাম নাকি!”^৯ (পৃষ্ঠা - ১৩২, বাল্যস্মৃতি, সুচরিতা দাশ, বসুমতি সাহিত্য মন্দির)

রাজকুমারী অমৃতকুমারী ছিলেন রাজা হরমণ সিং-এর কন্যা। স্বাধীন ভারতে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। চেহারা এই মিল সত্যিই অবিশ্বাস্য পর্যায়ের সত্যি!

এছাড়াও কালক্রমে বনলতা সেনের বহু রকমের প্রচ্ছদ হয়েছে। ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি তো বটেই কিংবদন্তি হয়েছে কাব্যগ্রন্থটিও। তার নানা আশ্চর্য বিচিত্র রূপও বইয়ের দোকানে হামেশাই মেলে। জীবনানন্দ জীবিত থাকলে এই

প্রচ্ছদগুলি দেখে তিনি হতাশ হতেন ঢের বেশি। কখনও বাস্তবের কোনও নারীর আলোকচিত্র ব্যবহার- যে আলোকচিত্রে নেই মুনশিয়ানার বিন্দুমাত্র ছাপ। কোথাও বা ‘বনলতা সেন’ ও ‘জীবনানন্দ দাশ’ কুৎসিত টাইপোগ্রাফিতে, কোনও রংকে নেপথ্যে রেখে গড়ে তোলা হয়েছে প্রচ্ছদ। অবশ্য বাংলায় যে সমস্ত বই সময়-উত্তীর্ণ - সেইসব বই বইয়ের ক্ষেত্রেই এমনটা দেখা গিয়েছে। এই অতি-শিথিল প্রচ্ছদ প্রমাণ করে, লেখকের চাহিদা, কাব্য-উপন্যাস-গল্পের চাহিদাও। ‘পপুলার লিটারেচার’ বা ‘জনপ্রিয় সাহিত্য’র নেপথ্যে এই প্রচ্ছদগুলিরও অবদান কিছু কম নয়।

Reference:

১. কারুবাসনা, জীবনানন্দ সমগ্র, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬ কলকাতা, ৭০০০১৩, পৃ.৩৯
২. কারুবাসনা, জীবনানন্দ সমগ্র, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬ কলকাতা, ৭০০০১৩, পৃ.৪০
৩. দাস, সজনীকান্ত, শনিবারের চিঠি, সংখ্যা ১৭, বর্ষ ১৩৫৯
৪. বনলতা সেন: ষাট বছরের পাঠ, সম্পাদনা : সৈকত হাবিব, কথাপ্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ.১৬৮
৫. দে, বিষ্ণু, যামিনী রায়: তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক, আশা প্রকাশনী, মহালয়া, ১৩৮৪, পৃ.৮৪
৬. জীবনানন্দ পত্রাবলি, সম্পাদনা ও ভূমিকা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০২২, পৃ.১৫০
৭. জীবনানন্দ পত্রাবলি, সম্পাদনা ও ভূমিকা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০২২, পৃ.১৫০
৮. জীবনানন্দ পত্রাবলি, সম্পাদনা ও ভূমিকা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০২২, পৃ.১৭৪
৯. দাশ, সুচরিতা, বাল্যস্মৃতি, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১৩২

Bibliography:

- বনলতা সেন, ষাট বছরের পাঠ, সম্পাদনা : সৈকত হাবিব, কথাপ্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৯
- জীবনানন্দ পত্রাবলি, সম্পাদনা ও ভূমিকা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ
- জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা। বিভাব পত্রিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
- এই সময় ও জীবনানন্দ, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬
- জীবনানন্দ, অরুণেশ ঘোষ, কবিতীর্থ, জানুয়ারি, ১৯৯৮

চিত্রপঞ্জী

১. শম্ভু সাহা কৃত ‘বনলতা সেন’-এর প্রথম প্রচ্ছদ, কবিতা ভবন, ১৯৪২
২. সত্যজিৎ রায় কৃত ‘বনলতা সেন’-এর প্রচ্ছদ, সিগনেট, ১৯৫২